জোঁক আবু ইসহাক

সেদ্ধ মিষ্টি আলুর কয়েক টুকরো পেটে জামিন দেয় ওসমান। ভাতের অভাবে অন্য কিছু দিয়ে উদরপূর্তির নাম চাষী-মজুরের ভাষায় পেটে জামিন দেয়া। চাল যখন দুর্মূল্য তখন এ ছাড়া উপায় কি?

ওসমান হুঁক্কা নিয়ে বসে। মাজু বিবি নিয়ে আসে রয়নার তেলের বোতল। হাতের তেলোয় ঢেলে সে স্বামীর পিঠে মালিশ করতে শুরু করে।

ছ' বছরের মেয়ে টুনি জিজ্ঞেস করে—এই তেল মালিশ করলে কি অয় মা?

—পানিতে কামড়াতে পারে না। উত্তর দেয় মাজু বিবি।

—পানিতে কামড়ায়! পানির কি দাঁত আছে নি?

—আছে না আবার। ওসমান হাসে। —দাঁত না থাকলে কামড়ায় ক্যামনে?

টুনি হয়তো বিশ্বাস করত। কিন্তু মাজু বিবি বুঝিয়ে দেয় মেয়েকে—ঘাস-লতা-পাতা, কচু-ঘেঁচু পইচ্যা বিলের পানি খারাপ অইয়া যায়। অই পানি গতরে লাগলে কুটকুট করে। ওরেই কয় পানিতে কামড়ায়।

ওসমান হুঁক্কা রেখে হাঁক দেয়,—কই গেলি তোতা? তামুকের ডিব্বা আর আঙনের মালশা লইয়া নায় যা। আমি আইতে আছি।

তেল নিয়ে এবার ওসমান নিজেই শুরু করে। পা থেকে গলা পর্যন্ত ভালো করে মালিশ করে। মাথায় আর মুখে মাখে সর্ষের তেল। তারপর কাস্তে ও হুঁক্কা নিয়ে সে নৌকায় ওঠে।

তেরো হাতি ডিঙিটাকে বেয়ে চলে দশ বছরের ছেলে তোতা। ওসমান পায়ের চটচটে তেল মালিশ করতে করতে চারদিকে চোখ বুলায়।

শ্রাবণ মাসের শেষ। বর্ষার ভরা যৌবন এখন। খামখেয়ালী বর্ষণ বৃষ্টির। আউশ ধান উঠে যাওয়ায় আমন ধানের গাছগুলো মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তাদের সতেজ ডগা চিকচিক করছে ভোরের রোদে।

দেখতে দেখতে পাটক্ষেতে এসে যায় নৌকা। পাট গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে ওসমানের চোখ তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। যেমন মোটা হয়েছে, লম্বাও হয়েছে প্রায় দুই-মানুষ সমান। তার খাটুনি সার্থক হয়েছে। সে কি যেমন-তেমন খাটুনি! রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে ক্ষেত চষা রে—ঢেলা ভাঙ্গা রে—'উড়া' বাছো রে—তারপর বৃষ্টি হলে আর এক চাষ দিয়ে বীজ বোনো। পাটের চারা বড় হয়ে উঠলে আবার ঘাস বাছো, 'বাছট' করো। 'বাছট' করে খাটো চিকন গাছগুলোকে তুলে না ফেললে সবগুলোই টিঙটিঙে থেকে যায়। কোষ্টায় আয় পাওয়া যায় না মোটেই।

এত পরিশ্রমের ফসল কিন্তু তার একার নয়। সে-তো শুধু ভাগচাষী। জমির মালিক ওয়াজেদ চৌধুরী ঢাকায় বড় চাকরী করেন। দেশে গোমস্তা রেখেছেন। সে কড়ায় গণ্ডায় অর্ধেক ভাগ আদায় করে নেয়। মরশুমের সময় তাঁর ছেলে ইউসুফ ঢাকা

থেকে আসে। ধান পাট বিক্রি করে টাকা নিয়ে আবার ঢাকা চলে যায়। গত বছর বাইনের সময় ও একবার এসেছিল। এসে কাগজে কাগজে টিপসই নিয়ে গেছে ভাগচাষীদের। এর আগে জমির বিলি-ব্যবস্থা মুখেমুখেই চলত।

দীর্ঘ সুপুষ্ট পাট গাছ দেখে যে আনন্দ হয়েছিল ওসমানের, তার অনেকটা নিভে যায় এসব চিন্তায়। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে ভাবে—আহা, তার মেহনতের ফসলে যদি আর কেউ ভাগ না বসাত!

ওসমান লুঙ্গিটা কাছা মেরে নেয়। জোঁকের ভয়ে শক্ত করেই কাছা মারতে হয়। ফাঁক পেলে জোঁক নাকি মলদ্বার দিয়ে পেটের মধ্যে গিয়ে নাড়ী কেটে দেয়।

ওসমান পানিতে নামে। পচা পানি কবরেজি পাচনের মত দেখতে। গত দু'বছরের মত বন্যা হয়নি এবারও। তবু বুক সমান পানি পাটক্ষেতে। এ পাট না ডুবিয়ে কাটবার উপায় নেই।

কতগুলো পাটগাছ একত্র করে দড়ি দিয়ে বাঁধে ওসমান। ছাতার মত যে ছাইনিটা হয় তার নিচে হুঁকা, তামাকের ডিবা, আঙনের মালশা ঝুলিয়ে রাখে সে 'টাঙনা' দিয়ে।

নৌকা থেকে কাস্তেটা তুলে নিয়ে এবার সে বলে,—তুই নাও লইয়া যা গা। ইস্কুলতন তাড়াতাড়ি আইসা পড়বি।

—ইস্কুল ত চাইটার সময় ছুটি অইব।

—তুই ছুটি লইয়া আগে চইলা আইস্।

—ছুটি দিতে চায় না যে মাস্টার সাব।

—কামের সময় ছুটি দিতে পারব না, কেমন কথা। ছুটি না দিলে জিগাইস্, আমার পাটগুলো জাগ দিয়া দিতে পারবনি তোগ মাস্টার।

তোতা নৌকা বেয়ে চলে যায়। ওসমান ডুবের পর ডুব দিয়ে চলে। লোহারুর দোকান থেকে সদ্য আল কাটিয়ে আনা ধারাল কাস্তে দিয়ে সে পাটের গোড়া কাটে। কিন্তু চার পাঁচটার বেশি পাট কাটতে পারে না এক ডুবে। এক হাতা পাট কাটতে তিন-চার ডুব লেগে যায়। একের পর এক দশ বারো ডুব দিয়ে হাঁপিয়ে ওঠা দমটাকে তাজা করবার জন্যে জিরোবার দরকার হয়। কিন্তু এই জিরোবার সময়টুকুও বৃথা নষ্ট করবার উপায় নেই। কাস্তেটা মুখ দিয়ে কামড়ে ধরে হাতা বাঁধতে হয় এ সময়। প্রথম দিকে দশ ডুবে তিন হাতা কেটে জিরানো দরকার হয়। কিন্তু ডুবের এই হার বেশিক্ষণ থাকে না। ক্রমে আট ডুব, ছয় ডুব, চার ডুব, দুই ডুব এমন কি এক ডুবের পরেও জিরানো দরকার হয়ে পড়ে। অন্য দিকে ডুব প্রতি কাটা পাটের পরিমাণও কমতে থাকে। শুরুতে যে এক হাতা পাট কাটতে তিন-চার ডুব লাগে তা কাটতে শেষের দিকে লেগে যায় সাত-আট ডুব।

পেটের জামিনের মেয়াদ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ কাজ ভালোই হয়। মাঝে মাঝে ঠিকের ওপর উঠবার আগেই পেটের মধ্যের ক্ষুধা-রাফস খাম-খাম শুরু করে দেয়।

ওসমান আমল দেয় না প্রথম দিকে। পাট কেটেই চলে ডুব দিয়ে দিয়ে। কিন্তু আমল দিতে হয় যখন মোচড়ানি শুরু হয় নাড়ী-ভুঁড়ির মধ্যে, চোখ ঝাপসা হয়ে আসে, মাথা বিম্বিম্ব করে, হাত-পাগুলো নিস্তেজ হয়ে আসতে থাকে।

ওসমান একবার ভাবে ঘরে যাওয়ার কথা। ডাকবে নাকি সে ছেলেকে নৌকা নিয়ে আসবার জন্যে? কিন্তু কাজ যে অর্ধেকও হয়নি এখনো। আশি হাতা পাট কাটার সঙ্কল্প নিয়ে সে জমিতে এসেছে।

পরক্ষণেই আবার সে ভাবে—তোতা ত এখনো ইস্কুল থেকেই ফেরেনি। আর ঘরে এত সকালে রান্না হওয়ার কথাও ত নয়।

পাশেই কিছুদূরে একটা শালুক ফুল দেখতে পায় ওসমান। তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। পেটে জামিন দেয়ার এত সহজ উপায়টা মনে না থাকার জন্যে নিজের ওপর বিরক্ত হয় সে। এদিক ওদিক থেকে ডুব দিয়ে দিয়ে সে শালুক তোলে গোটা দশ-বারো। ক্ষুধার জ্বালায় বিকট গন্ধ উপেক্ষা করে কাঁচাই খেয়ে ফেলে তার কয়েকটা। বাকিগুলো মালশার আঙনে পুড়িয়ে খেয়ে নেয়।

ওসমান আবার শুরু করে—সেই ডুব দেয়া, পাটের গোড়া কাটা, হাতা বাঁধা। বেলা গড়িয়ে গেছে অনেকটা। প্রত্যেক ডুবের পর জিরোতে হয় এখন। পাটও একটা-দু'টোর বেশি কাটা যায় না এক ডুবে। অনেকক্ষণ পানিতে থাকার দরুন শরীরে মালিশ করা তেল ধুয়ে গেছে। পানির কামড়ানি শুরু হয়ে গেছে এখন। ওসমানের মেজাজ বিগড়ে যায়। সে গালাগাল দিয়ে ওঠে, 'আমরা না খাইয়া শুকাইয়া মরি, আর এই শালার পাটগুলো মোট্রা অইছে কত। কাচিতে ধরে না। ক্যান, চিক্কন চিক্কন অইতে দোষ আছিল কি? হে অইসে এক পোচে দিতাম সাবাড় কইরা।'

ওসমান তামাক খেতে গিয়ে দেখে মালশার আঙন নিভে গেছে। কিছুক্ষণ আগেই বৃষ্টি হয়েছিল একপশলা। পাটগাছের ছাইনি বৃষ্টি ঠেকাতে পারেনি।

ওসমান এবার ক্ষেপে যায়। গা চুলকাতে চুলকাতে সে একচোট গালাগাল ছাড়ে বৃষ্টি আর পচা পানির উদ্দেশে। তারপর হঠাৎ জমির মালিকের ওপর গিয়ে পড়ে তার রাগ। সে বিড়বিড় করে বলে,—ব্যাডা তো ঢাকার শহরে ফটেং বাবু অইয়া বইসা আছে। থাবাডা দিয়া আধাডা ভাগ লইয়া যাইব। ব্যাডারে একদিন পচা পানির কামড় খাওয়াইতে পারতাম!

ওসমান আজ আর কাজ করবে না। সিদ্ধান্ত করবার সাথে সাথে সে জোরে ডাক দেয়, তোতারে—উ—

দুই ডাকের পর ওদিক থেকে সাড়া আসে, আহি—অ—

—আয়, তোর আহিডা বাইর করমু হনে।

পাটের হাতাগুলো এক জায়গায় জড় করতে করতে গজগজ করে ওসমান,—আমি বুইড়্যা খাইট্যা মরি আর ওরা একপাল আছে বইসা গিলবার।

তোতা নৌকা নিয়ে আসে। এত সকালে তার আসার কথা নয়। তবুও ওসমান ফেটে পড়ে, এতক্ষণ কি করছিলি, অ্যাঁ? তোরে না কইছিলাম ছুটি লইয়া আগে আইতে? ছুটি না দিলে পলাইয়া আইতে পারস নাই?

—আগেই আইছিলাম। মা কইছিল আর একটু দেরি কর। ভাত অইলে ফ্যানডা লইয়া যাইস।

—ফ্যান আনছস? দে দে শিগ্নীর।

তোতা মাটির খোরাটা এগিয়ে দেয়।

লবণ মেশান একখোরা ফেন। ওসমান পানির মধ্যে দাঁড়িয়েই চুমুক দেয়। সবটা শেষ করে অস্ফুটস্বরে বলে,—শুকুর আলহামদুলিল্লাহ।

ফেনটুকু পাঠিয়েছে এ জন্যে স্ত্রীকেও ধন্যবাদ জানায় তার অন্তরের ভাষা। এ রকম খাটুনির পর এ ফেনটুকু পেটে না দিলে সে পানি থেকে উঠতেই পারে না নৌকার ওপর। এবার আউশ ধান কাটার সময় থেকেই এ-দশা হয়েছে। অথচ কতইবা আর তার বয়স! চল্লিশ হয়েছে কি হয়নি।

ওসমান পাটের হাতাগুলো তুলে ধরে। তোতা সেগুলো টেনে তোলে নৌকায় গুনে গুনে সাজিয়ে রাখে। পাট তুলতে তুলতে ওসমান জিজ্ঞেস করে ছেলেকে,—কি রাশে রে তোর মা?

—ট্যাংরা মাছ আর কলমী শাক।

—মাছ পাইল কই?

—বড়শী দিয়া ধরছিল মায়।

ওসমান খুশী হয়।

পাট সব তোলা হয়ে গেলে ওসমান নৌকায় ওঠে। নৌকার কানিতে দুই হাতের ভর রেখে অতি কষ্টে তাকে উঠতে হয়।

—তোমার পায়ে কালা উইডা কী, বা'জান? তোতা ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বলে।

—কই?

—উই যে! জোঁক না জানি কী! আঙ্গুল দিয়ে দেখায় তোতা।

—হ, জোঁকই ত রে! এইডা আবার কোনসুম লাগল? শিল্লীর কাচিটা দে।

তোতা কাস্তেটা এগিয়ে দেয়। ভয়ে তার শরীরের সমস্ত লোম কাঁটা দিয়ে উঠেছে।

ডান পায়ের হাঁটুর একটু ওপরেই ধরেছে জোঁকটা। প্রায় বিষতথানেক লম্বা। করাতে জোঁক। রক্ত খেয়ে ধুমসে উঠেছে।

ওসমান কাস্তেটা জোঁকের বুকের তলা দিয়ে ঢুকিয়ে দেয়। এবার একটা শক্ত কাঠি দিয়ে জোঁকটা কাস্তের সাথে চেপে ধরে পোচ মারে পা থেকে।

—আঃ বাঁচলাম রে! ওসমান স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

—ইস্, কত রক্ত! তোতা শিউরে ওঠে।

ছেলের দিকে তাকিয়ে ওসমান তাড়া দেয়,—নে এইবার লগি মার তাড়াতাড়ি।

তোতা পাট বোঝাই নৌকাটা বেয়ে নিয়ে চলে।

জোঁক হাঁটুর যেখানটায় চুমুক লাগিয়েছিল সেখান থেকে তখনও রক্ত ঝরছে। সে দিকে তাকিয়ে তোতা জিজ্ঞেস করে,— বা'জান কেমন কইরা জোঁক ধরল তোমারে, টের পাও নাই?

—না রে বাজান, এগুলো কেমন কইরা যে চুমুক লাগায় কিছুই টের পাওয়া যায় না। টের পাইলে কি আর রক্ত খাইতে পারে?

—জোঁকটা কত বড়, বাপপুসরে—

—দুও বোকা! এইডা আর এমুন কী জোঁক। এরচে' বড় জোঁকও আছে।

জমি থেকে পাট কেটে ফেলার পরেও ঝামেলা পোয়াতে হয় অনেক। জাগ দেয়া, কোষ্টা ছাড়ান, কোষ্টা ধুয়ে পরিষ্কার করা, রোদে শুকানো—এ কাজগুলো কম মেহনতের নয়।

পাট শুকাতে না শুকাতেই চৌধুরীদের গোমস্তা আসে। একজন কয়াল ও দাড়িপাল্লা নিয়ে সে নৌকা ভিড়ায় ওসমানের বাড়ির ঘাটে।

বাপ-বেটায় শুকনো পাট এনে রাখে উঠানে। মেপে মেপে তিন ভাগ করে কয়াল। ওসমান ভাবে তবে কি তে-ভাগা আইন পাস হয়ে গেছে? তার মনে খুশী ঝলক দিয়ে ওঠে।

গোমস্তা হাঁক দেয়,—কই ওসমান, দুই ভাগ আমার নায় তুইল্যা দাও।

ওসমান হাঁ করে চেয়ে থাকে।

—আরে মিয়া, চাইয়া রইছ ক্যান? যাও।

—আমারে কি এক ভাগ দিলেন নি?

—হাঁ

—ক্যান?

—ক্যান আবার! নতুন আইন আইছে জান না? তে-ভাগা আইন।

—তে-ভাগা আইন! আমি ত হে অইলে দুই ভাগ পাইমু।

—হঁ, দিব হনে তোমারে দুই ভাগ। যাও ছোড হুজুরের কাছে!

—হঁ, এহনই যাইমু।

—আইচা যাইও যহন ইচ্ছা। এহন পাট দুই ভাগ আমার নায় তুইল্যা দিয়া কথা কও।

—না, দিমু না পাট। জিগাইয়া আহি।

—আরে আমার লগে রাগ করলে কি অইব? যদি হুজুর ফিরাইয়া দিতে কন তহন না হয় কানে আইটা ফিরত দিয়া যাইমু।

ওয়াজেদ চৌধুরীর ছেলে ইউসুফ বৈঠকখানার বারান্দায় বসে সিগারেট ফুঁকছে। ওসমান তার কাছে এগিয়ে যায় ভয়ে ভয়ে। তার পেছনে তোতা।

—হুজুর, ব্যাপারডা কিছু বুঝতে পারলাম না। ওসমান বলে।

—কী ব্যাপার? সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে ইউসুফ।

—হুজুর, তিন ভাগ কইরা এক ভাগ দিছে আমারে।

—হ্যাঁ, ঠিকই ত দিয়েছে।

ওসমান হাঁ করে চেয়ে থাকে।

—বুঝতে পারলে না? লাঙ্গল-গরু কেনার জন্যে টাকা নিয়েছিলে যে পাঁচ শ’।

ওসমান যেন আকাশ থেকে পড়ে।

—আমি টাকা নিছি? কবে নিলাম হুজুর?

—হ্যাঁ, এখন ত মনে থাকবেই না। গত বছর কাগজে টিপসই দিয়ে টাকা নিয়েছিলে, মনে পড়ে? গরু-লাঙ্গল কেনার জন্যে টাকা দিয়েছি। তাই আমরা পাব দু’ভাগ, তোমরা পাবে এক ভাগ। তে-ভাগা আইন পাস হয়ে গেলে আধা-আধা সেই আগের মত পাবে।

—আমি টাকা নেই নাই। এই রকম জুলুম খোদাও সহ্য করব না।

—যা-যা ব্যাটা, বেরো। বেশি তেড়িবেড়ি করলে এক কড়া জমি দেব না কোনো ব্যাটারে।

ওসমান টলতে টলতে বেরিয়ে যায় ছেলের হাত ধরে।

ইউসুফ ক্রুর হাসি হেসে বলে,—তে-ভাগা! তে-ভাগা আইন পাস হওয়ার আগে থেকেই রিহাসাল দিয়ে রাখছি।

সিগারেটে একটা টান দিয়ে আবার সে বলে,—আইন! আইন করে কি আর আমাদের আটকাতে পারে! আমরা সুচের ফুটো দিয়ে আসি আর যাই। হোক না আইন। কিন্তু আমরা জানি, কেমন করে আইনকে ‘বাইপাস’ করতে হয়। হুঁ হুঁ হুঁ।

শেষের কথাগুলো ইউসুফের নিজের নয়। পিতার কথাগুলোই ছেলে বলে পিতার অনুকরণে।

গত বছরের কথা। প্রস্তাবিত তে-ভাগা আইনের খবর কাগজে পড়ে ওয়াজেদ চৌধুরী এমনি করে চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিলেন কথাগুলো।

আইনের একটা ধারায় ছিল—‘জমির মালিক লাঙ্গল-গরু সরবরাহ করিলে বা ঐ উদ্দেশ্যে টাকা দিলে উৎপন্ন শস্যের অর্ধাংশ পাইবেন।’—এই সুযোগেরই সদ্ব্যবহারের জন্যে তিনি ছেলেকে পাঠিয়ে কাগজে কাগজে টিপসই আনিয়েছিলেন ভাগ-চাষীদের।

ফেরবার পথে তোতা জিজ্ঞেস করে,—বা’জান কেমন কইর্যা লেইখ্যা রাখছিল? টিপ দেওনের সময় টের পাও নাই?

ছেলের প্রশ্নের উত্তর দেয় না ওসমান। একটা দীর্ঘশ্বাসের সাথে তার মুখ থেকে শুধু উচ্চারিত হয়—আহ-হা-রে!

তোতা চমকে তাকায় পিতার মুখের দিকে। পিতার এমন চেহারা সে আর কখনো দেখেনি।

চৌধুরীবাড়ির সীমানা পার হতেই ওসমান দেখে—করিম গাজী, নবুখাঁ ও আরো দশ বারোজন ভাগ-চাষী এদিকেই আসছে।

করিম গাজী ডাক দেয়,—কি মিয়া, শেখের পো? যাও কই?

—গেছিলাম এই বড় বাড়ি। ওসমান উত্তর দেয়, —আমারে মিয়া মাইর্যা ফালাইছে এক্কেরে। আমি বোলে টাকা নিছিলাম পাঁচ শ’।

কথা শেষ না হতেই নবুখাঁ বলে,—ও, তুমিও টিপ দিছিল কাগজে?

—হঁ ভাই, কেমন কইরা যে কলমের খোঁচায় কি লেইখ্যা থুইছিল কিছুই টের পাই নাই। টের পাইলে কি আর এমুনডা অয়। টিপ নেওনের সময় গোমস্তা কইছিল, ‘জমি বর্গা নিবা, তার একটা দলিল থাকা ত দরকার।’

—হঁ, বেবাক মাইনষেরেই এম্বায় ঠকাইছে। করিম গাজী বলে, —আরে মিয়া এমুন কারবারডা অইল আর তুমি ফির্ফা চলেছা?

—কি করমু তয়?

—কি করবা! খেঁকিয়ে ওঠে করিম গাজী, চল আমাগ লগে দেখি কি করতে পারি!

করিম গাজী তাড়া দেয়,—কি মিয়া, চাইয়া রইছ ক্যান? আরে এমনেও মরছি অমনেও মরছি। একটা কিছু না কইর্যা ছাইড়া দিমু?

ওসমান তোকাকে ঠেলে দিয়ে বলে,—তুই বাড়ি যা গা।

তার ঝিমিয়ে-পড়া রক্ত জেগে ওঠে। গা ঝাড়া দিয়ে সে বলে,—হঁ, চল। রক্ত চুইষ্যা খাইছে। অজম করতে দিমু না, যা থাকে কপালে।